‘কৃষক নিজের উন্নয়ন নিজেই করেছে সরকারি সহযোগিতা পেলে দেশের চেহারা বদলে যেত’

শাইখ সিরাজ

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **গোলাম মোর্তোজা**

সাপ্তাহিক ২০০০ : আমরা যারা শহরে থাকি তারা অনেকেই গ্রামের কৃষক পরিবার থেকে উঠে আসা। কিন্তু নগর জীবনের এক পর্যায়ে এসে আমরা আর গ্রাম বা কৃষকের কথা মনে রাখতে চাই না। যতদূর জানি আপনি শহরে বড় হওয়া একজন মানুষ। কর্মক্ষেত্রও শহর। এই গ্রামে ফিরে যাওয়ার তাগিদটা অনুভব করলেন কেন, কৃষকের কাছে ফিরে যাওয়ার আগ্রহটা জন্মালো কিভাবে?

শাইখ সিরাজ : আমার জন্ম চাঁদপুরে। এক বছর বয়স থেকেই ঢাকায় থাকি। তার মানে আপাদমস্তক শহুরে বলতে যা বোঝায় আমি তাই। সত্তর দশক থেকে বিচ্ছিন্নভাবে টেলিভিশনের কিছু অনুষ্ঠান করি। যেমন ইউনিভার্সিটি ম্যাগাজিন, প্রাণ তরঙ্গ, খেলাধুলার অনুষ্ঠান ইত্যাদি।

২০০০ : টেলিভিশনে যুক্ত হলেন কিভাবে?

শাইখ সিরাজ : ফরিদুর রেজা সাগরের মাধ্যমে আমি টেলিভিশনে সম্পৃক্ত হই। আমাদের টেলিভিশনে বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের আধিক্য আগেও বেশি ছিল, এখনও বেশি। তবে টেলিভিশনের জন্মলগ্ন থেকেই কিন্তু কৃষিবিষয়ক অনুষ্ঠান ছিল । এক সময় ‘কাজের কথা’ নামে একটি অনুষ্ঠান ছিল। গ্রামের মানুষের কাজ নিয়ে তখন আমি অনুষ্ঠানটি করি।

২০০০ : তখন অনুষ্ঠানটির নাম কী ছিল?

শাইখ সিরাজ : আমার দেশ। ১৯৮৬ তে এসে অনুষ্ঠানটির সময় সাড়ে চারটার জায়গায় সাতটা বা সোয়া সাতটায় করা হলো। তখন অনুষ্ঠানটি ছিল পাক্ষিক, পঞ্চাশ মিনিট করে। এটাকে পঁচিশ মিনিট করে সাপ্তাহিক করে দেয়া হলো। কর্তৃপক্ষ সেই সঙ্গে নামটিও বদলে ‘মাটি ও মানুষ’ রাখলো। আমি যতটুকু শুনেছি এরশাদ সাহেব নাকি জানিয়েছিলেন যে এ অনুষ্ঠানটির নাম ‘মাটি ও মানুষ’ হলে ভালো হয়। তখন মোস্তফা কামাল সৈয়দ বিটিভি’র মহাপরিচালক ছিলেন। ১৯৮৬ সালে নাম বদলের পাশাপাশি অনুষ্ঠানের কাঠামোকে আমি বদলে দিলাম। এলাকাভিত্তিক সাফল্যকে নিয়ে এলাম ব্যক্তিভিত্তিক সাফল্যে। প্রচলিত দেশী জাতের ধান চাষ করে হয়তো কোনো কৃষক বিঘায় দশ মণ ধান পেত, এখন পাচ্ছে ত্রিশ মণ। এটা দেখে অন্যান্য কৃষক উদ্বুদ্ধ হয়েছে।

‘কৃষি মানে একটি সমন্বিত ব্যবস্থা। ধানক্ষেতে মাছের চাষ হবে, আইলে সবজির চাষ হবে। শহরে বাড়ির ছাদে গৃহিণী মুরগির খামার করবে। বেকার কেউ গ্রামে ফিরে গিয়ে পতিত জলাশয়ে মাছের চাষ করবে। এ সামগ্রিক ব্যাপারটাই হচ্ছে কৃষি’

তারপর নব্বই দশকে এসে দেখলাম কৃষি মানেই ধান আর পাট লাগানো নয়। কৃষক মানেই গ্রামের বিশেষ এক ধরনের লোক নয়। কৃষি মানে একটি সমন্বিত ব্যবস্থা। ধানক্ষেতে মাছের চাষ হবে, আইলে সবজির চাষ হবে। শহরে বাড়ির ছাদে গৃহিণী মুরগির খামার করবে। বেকার কেউ গ্রামে ফিরে গিয়ে পতিত জলাশয়ে মাছের চাষ করবে। এ সামগ্রিক ব্যাপারটাই হচ্ছে কৃষি। প্রতিটা ক্ষেত্র থেকে যখন অর্থ আসবে, কৃষক তখন শক্তিশালী হবে। তার গায়ে কাপড় আসবে। বাচ্চা স্কুলে যাবে। আমি বোঝাতে চেয়েছি, কৃষি মানেই ধান আর পাট নয়। কৃষক মানেই গ্রামের মানুষ নয়। শহরের মানুষও কৃষক হতে পারে। এ সময় রূপক একটা বিষয় ছিল হাকিম আলীর মৎস্য খামার। হাকিম আলী টাকা গুনছে। চোখগুলো বড় হয়ে যাচ্ছে। তার স্ত্রী ভাসা তেলে মাছের মুড়ো ভাজছে। এভাবেই এক সময় ‘মাটি ও মানুষ’ অনুষ্ঠানটি সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠলো।

২০০০ : উচ্চ ফলনশীল বীজ চাষ বিষয়ে দেশে-বিদেশে প্রচুর বক্তব্য আছে এর পক্ষে-বিপক্ষে। এই যে তর্ক-বিতর্ক, এটা কি শুধুই আবেগের বশবর্তী হয়ে, নাকি এ বিতর্কের পেছনে যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে?

শাইখ সিরাজ : এ তর্ক-বিতর্কের পেছনে রয়েছে আবেগ এবং অজ্ঞতা। আমরা ধরেই নেই যে কৃষি বিষয়ক যাবতীয় জ্ঞান থাকা দরকার শুধু কৃষকের। কিন্তু আমাদের মতো একটি দেশে কৃষিবিষয়ক জ্ঞান সবার থাকা দরকার। এ জ্ঞানটা থাকলে আবেগ এবং অজ্ঞতা কোনোটাই থাকতো না। উচ্চ ফলনশীল শস্যের আবাদের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে ষাটের দশকের গোড়ায় সবুজ বিপ্লব থেকে। ভারতীয় একজন বিজ্ঞানী সবুজ বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন। কারণ তখন পৃথিবীর জনসংখ্যা যেভাবে বাড়ছিল তা ছিল

আশঙ্কাজনক। চল্লিশ বছর আগে তো আর পরিবার পরিকল্পনার জ্ঞান এখনকার মতো ছিল না। জ্যামিতিক হারে জনসংখ্যা বাড়ছিল। দুই, চার, আট, ষোল, বত্রিশ এভাবে। আর খাদ্য উৎপাদন বাড়ছিল এক, দুই, তিন এভাবে। ভয়াবহ খাদ্য বিপর্যয় হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিল। এখনো এর উত্তরণ ঘটেনি পুরোপুরি। পৃথিবীর অনেক জায়গায় ইথিওপিয়া বা অন্যান্য অনেক জায়গার মানুষ এখনো না খেয়ে থাকে। আমরা তখন উৎপাদন করতাম দেশীয় পদ্ধতিতে, দেশীয় বীজ দিয়ে। যার উৎপাদন ক্ষমতা হচ্ছে বিঘায় পাঁচ মণ। তখন ওই জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংটা এলো। দেশীয় জাতকে নিয়ে অন্য একটি উচ্চফলনশীল বা ভালো জাতের শঙ্করায়ন করে নতুন একটি জাতের উদ্ভাবন করা হলো। ইরি বা বিড়ি ধান, যা বিঘায় পাঁচ মণের জায়গায় বিশ বা ত্রিশ মণ ফলন হবে। তাহলেই ঐ বর্ধিত জনসংখ্যার সঙ্গে চলা সম্ভব হবে। সে জন্যই আশি বা নব্বই দশকে এসে খাদ্য সংকটটা সেভাবে হয়নি। নিজেদের দিয়েই বিষয়টি বোঝা যায়। ১৯৭১-এ আমাদের দেশে জনসংখ্যা ছিল সাত কোটি। আজ ২০০৫ সালে সেটা দাঁড়িয়েছে পনেরো কোটির ওপরে। সত্তর সালে যে আবাদি ভূমি ছিল, ২০০৫ সালে এসে সেটা কমেছে। এ জমি থেকেই কিন্তু পনেরো কোটি মানুষকে খাওয়াতে হচ্ছে। দেশীয় পদ্ধতির চাষে থাকলে বর্তমানে চালের দাম হতো প্রতি কেজি দেড়'শ টাকা। তাও ঠিকমতো পাওয়া যেত না। তাহলে কোনটা বাস্তবতা? মানুষ বাঁচানো, নাকি পরিবেশ দেখা? হ্যাঁ, এখন এসেছে পরিবেশ দেখার সময়। পরিবেশ বান্ধব কথাটা এসেছে এ জন্য। তারপরও সম্ভব নয়। কেননা, এইচ.ওয়াই, ভি এটা তার সর্বোচ্চ ফলন দিয়ে ফেলেছে। বয়স হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এটা মাইনাসে চলে যাচ্ছে। ওখানে হাই ব্রিড না দিলে এখন আর আগানো সম্ভব নয়। আবার জনসংখ্যা বেড়ে যাবে, খাদ্য উৎপাদন কমতে থাকবে। কোটি কোটি মানুষকে খাদ্য দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা হবে, নাকি দেশীয় পদ্ধতিতে চাষ করে কোটি কোটি মানুষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়া হবে? ত্রিশটা ঢেঁকিতে সারা দিনে ত্রিশ কেজি চাল ছাঁটবেন নাকি এর পরিমাণ বাড়ানোর জন্য মেশিনে ভাঙাবেন এটা বিবেচনার বিষয়। পরিবেশ বান্ধব বিষয়টির সঙ্গে আমার কোনো দ্বিমত নেই। কিন্তু প্রয়োজন মেটানোটা আগে। সারা পৃথিবীতেই দুটো পদ্ধতি পাশাপাশি আছে। যেটা রাসায়নিকভাবে উৎপাদিত তার মূল্য ত্রিশ টাকা, আর যেটা জৈবিক, প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত তার মূল্য ৩০০ টাকা, যার যেটা সামর্থ্য সে সেটা কিনবে।

২০০০ : আমাদের নানা জাতের ধান হারিয়ে যাচ্ছে।

শাইখ সিরাজ : তার সঙ্গে তো এ পদ্ধতির কোনো বিরোধ নেই। দেশীয় নানা জাতের ধান সংরক্ষণ করতে তো কোনো সমস্যা নেই। ঐ বীজগুলো জিন ব্যাংকে রেখে দেয়া যেতে পারে।

২০০০ : আমাদের দেশে তো সে ব্যবস্থাটা নেই।

শাইখ সিরাজ : সেজন্য তো রাষ্ট্রব্যবস্থা দায়ী।

২০০০ : আগে আমাদের কৃষকরা নানা জাতের ধান সারা বছর আবাদ করতেন। নিজের ঘরেই বীজ সংরক্ষণ করতেন। সেটাই আবার প্রতি বছর ব্যবহার করতেন।

শাইখ সিরাজ : হাইব্রিডের পক্ষে-বিপক্ষে দুটোরই যুক্তি আছে। আমার অনুষ্ঠান দেখলে বোঝা যাবে, আমি নিজেও হাইব্রিডের পক্ষে নই। এর কারণ, আমাদের দেশের কৃষকরা যেকোনো শস্যের নব্বই ভাগ বীজ এককভাবে নিজে রাখে। আর দশ ভাগ বিএডিসি বা অন্যান্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে সাপ্লাই দেয়। কৃষক নব্বই ভাগ বীজ নিজে রাখতো এ জন্য যে, বীজের জন্য তাকে আলাদা কোনো চাষ করতে হতো না। যে ধানের জমিতে ধান চাষ করছে, সেখানের ভালো জায়গা থেকে বীজটা তুলে ঘরে রেখে দিতো। এ বীজ রাখার ব্যবস্থাটা যদি বেসরকারি পর্যায়ে চলে যায় তাহলে এ দেশের কৃষকের জন্য কঠিন এবং কষ্টকর দিন আসবে। কারণ বেসরকারি বীজ উদ্যোক্তা বা সংরক্ষণকারী প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যবসায়ী। সে তো কৃষককে মায়া করবে না। আজ যেটা দশ টাকায় বিক্রি করেছে, আগামী বছর চাইবে ১১০ টাকায় বিক্রি করতে। আর্টিফিশিয়াল ক্রাইসিসি দেখা দেবে। কৃষককে মেরে ফেলবে। হাইব্রিডের বীজ কৃষক নিজে উৎপাদন করতে পারবে না। কৃষককে এ ব্যাপারে শিক্ষা দিতে হবে। চাষ করতে হবে। ক্রস ম্যাচিং করে বিভিন্ন পদ্ধতি খাটিয়ে কৃষককে তা সংরক্ষণ করতে হবে। এ কাজটা যথেষ্ট কঠিন। কিন্তু একে এখন আর অবহেলা করা যাবে না। যে যাই বলুক, হাইব্রিড ঢুকবেই। না হলে বর্তমান খাদ্য চাহিদা মেটানো সম্ভব নয়। এ জন্যে কৃষককে সচেতন করে তুলতে হবে।

২০০০ : এ কাজটা তো মূলত করতে হবে সরকারকে। কিন্তু আমাদের মতো দেশে এই বাস্তবতায় সরকার কৃষককে সচেতন করে তুলবে এ ব্যাপারে খুব আশাবাদী হওয়ার তো কারণ দেখি না।

শাইখ সিরাজ : একেবারে আশাবাদী না হওয়ারও কোনো কারণ নেই। এই যে সাফল্য সেটা কোত্থেকে এলো। সাত কোটি আর চৌদ্দ কোটি। এই এইচওয়াইভি থেকেই তো এ সাফল্যটা এসেছে। হ্যাঁ, এটা শিখতে ত্রিশ বছর সময় লেগেছে। বিএডিসি গত ত্রিশ বছরে মাত্র পাঁচ ভাগ উৎপাদন করতে পেরেছে। তাকে বলা হয়েছে আগামী দু'বছরের মধ্যে পঁচিশ ভাগ বীজ উৎপাদন করতে হবে। হাইব্রিড বীজ কৃষকের যেন ক্রাইসিস না হয়। যে ত্রিশ বছরে উৎপাদন করেছে মাত্র পাঁচ ভাগ। তাকে হুট করে দুই বছরে পঁচিশ ভাগ বীজ উৎপাদনের কথা বলার যুক্তি নেই। এখানে আমার বক্তব্য হচ্ছে- বীজ সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বীজ উৎপাদন এই জায়গাটাতে সরকারের খুব বলিষ্ঠভাবে কৃষককে জ্ঞান দিতে হবে, প্রশিক্ষণ দিতে হবে। ১৯৮০ সালের কৃষক আর ২০০৫ সালের কৃষক আকাশ-পাতাল পার্থক্য।

'দেশীয় পদ্ধতির চাষে থাকলে বর্তমানে চালের দাম হতো প্রতি কেজি দেড়'শ টাকা। তাও ঠিকমতো পাওয়া যেত না। তাহলে কোনটা বাস্তবতা? মানুষ বাঁচানো, নাকি পরিবেশ দেখা? হ্যাঁ, এখন এসেছে পরিবেশ দেখার সময়। পরিবেশ বান্ধব কথাটা এসেছে এ জন্য'

২০০০ : সরকারের এই উদ্যোগ নিয়ে কি আশাবাদী হওয়ার কোনো সুযোগ আছে?

শাইখ সিরাজ : অবশ্যই সুযোগ আছে। বাংলাদেশের অনেক জায়গায় কৃষক এখন ধান চাষ করে না। এটা যেমন আশঙ্কার, তেমনি পজেটিভ। একটা সময় ছিল যখন কৃষককে আর কিছু করুক না করুক ধান চাষ করতেই হবে। কারণ এর থেকেই তাকে বীজ রেখে ফসল ফলাতে হবে। আর তাকে এখান থেকেই খেয়ে-পরে বাঁচতে হতো। তার প্রধান চিন্তাই ছিল ঘরে চাল আছে কি না। সেই কৃষক এখন ধানের জমিতে ফুল, সবজি, গাজর, পেঁয়াজ চাষ করে বিভিন্ন লাভজনক শস্যে সে চলে গেছে। সে এখন ধান কিনে খায়। এর কারণ এক বিঘা জমিতে ধান চাষ করে কৃষক পায় তিন হাজার টাকা। আর অন্যান্য সবজি বা ফুল চাষ করে আয় করে ত্রিশ হাজার টাকা। কৃষকের এই আয় মানে কিন্তু গোটা দেশের আয়। এখন পাঁচ-দশ বছর পর চিত্রটা যদি এমন দাঁড়ায় যে, বাংলাদেশের মোট ধানী জমি থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ/চল্লিশ ভাগ কমে গেছে। জনসংখ্যা বাড়ার কারণে এবং বিভিন্ন ফসল চাষের কারণে দু'ভাবেই ধানী জমির পরিমাণ কমছে। তখন স্বাভাবিকভাবেই খাদ্যশস্য বাইরে থেকে আমদানি করতে হবে। কৃষক আগে সাত টাকা

দিয়ে চাল কিনতে ভয় পেত। এখন সে সতেরো টাকায় চাল কিনছে। তার মানে দাঁড়াচ্ছে, কৃষকের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ছে। পরিবর্তন এভাবে হবে। পরিবেশবাদীরা এককভাবে সেই কথাগুলো বলে, সেগুলো শুধুই চোখে ধুলো দেয়া। বাস্তবতা হচ্ছে এইচওয়াইভি এবং হাইব্রিড ছাড়া চলা সম্ভব নয়। এ পদ্ধতিকে কোনোভাবেই এড়ানো যাবে না। এ দুটোকে সমন্বয় করার জন্য কৃষককে সঠিকভাবে জ্ঞানটা দিতে হবে। আমার মতে, বীজ কোনোভাবেই বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের হাতে যাওয়া উচিত নয়। তাহলে দেশে ভয়াবহ আকাল লাগবে। বীজ ঘরে আছে বলে কৃষক শান্তিতে আছে। বন্যায় আর সবকিছু ভেসে গেলেও, কৃষক সন্তানের থেকেও বেশি আগলে রাখে বীজটাকে। কারণ ওইটা থাকলেই সে বাঁচবে। না হলে মারা যাবে।

২০০০ : তার মানে বেসরকারি খাতে বীজের নিয়ন্ত্রণটা চলে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে?

শাইখ সিরাজ : থেকেই যাচ্ছে। সরকারকে বারবার এই কথাটাই বলা হচ্ছে। কিন্তু সরকার বলছে বেসরকারি খাতে যেতেই হবে। আমাদের মতো একটি দেশে এটা কেন বেসরকারি খাতে দেয়া হবে? এ দেশটা কৃষিপ্রধান দেশ। সুতরাং কৃষকদের জন্যই প্রথম চিন্তাটা করা উচিত। আমরা মুক্তবাজার অর্থনীতির কথা বলছি। খুব ভালো। সেটা হতেই হবে। ভারতের মতো দেশ এতো বছর পরে হলেও কোক-ফানটাকে ঢুকতে দিতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু এই ত্রিশ বছরে সে তার লিমকা আর থামসআপকে জাতির জিভের মধ্যে, মেধার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে যে লিমকা-থামসআপ খেলে দেশের টাকা দেশে থাকবে। কোক-ফানটা খেলে টাকা বিদেশ চলে যাবে। একইভাবে আমরা নিজেদের দেশের একটা জিনিসকেও ওইভাবে স্টাবলিশ করতে পারিনি। আমরা সবকিছু নিয়ে মুক্তবাজার অর্থনীতিতে ঢুকে গেছি। ধরা যাক এক কেজি পেঁয়াজের উৎপাদন খরচ চার টাকা। এটা পাঁচ টাকায় বিক্রি না করলে পোষানো যাবে না। সরকার এখানে কৃষককে কোনো ভর্তুকিও দিচ্ছে না। ভারতীয় এক কেজি পেঁয়াজ পাওয়া যাচ্ছে সাড়ে তিন টাকায়। তাওলে ভোক্তা তো পাঁচ টাকারটা কিনবে না। সাড়ে তিন টাকারটাই কিনবে। ভারতীয় পেঁয়াজ সাড়ে তিন টাকায় উৎপাদন করছে। এখানে তার সরকারের ভতুর্কি আছে। ফলে মুক্তবাজার অর্থনীতিতে সে যেখানেই যাচ্ছে, টিকে থাকছে। আর আমাদের উৎপাদন খরচই চার টাকা। তাহলে ভারতীয় পেঁয়াজের সঙ্গে টিকে থাকবে কেমন করে!

২০০০ : আপনি বারবার খাদ্য সমস্যার কথা বলছেন। আমরা তো ঐ জায়গাটায় এখনো অনেক পিছিয়ে আছি। ধান, পাট ছাড়া আমরা যদি ইক্ষুর প্রসঙ্গে আসি, তাহলে দেখবো বাংলাদেশে এক মণ ইক্ষুতে যদি পাঁচ কেজি চিনি তৈরি হয়, ভারতে সেটা হয় সাড়ে সাত থেকে আট কেজি। স্বাভাবিকভাবেই বাজারে ভারতীয় চিনি কম দামে পাওয়া যায়, আমাদেরটা বেশি মূল্যে বিক্রি হয়। ভারতে চিনি কলের সংখ্যা বাড়ছে। আর আমাদের চিনিকল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কৃষক। সে তখন ইক্ষু চাষ থেকে বিরত থাকছে। আপনি যেহেতু বিভিন্ন সময়ে কৃষকদের কাছাকাছি থেকে বিষয়গুলো সম্পর্কে অনেক প্রত্যক্ষ ধারণা পেয়েছেন, তাই এ সম্পর্কে আপনার কাছে সঠিক তথ্য জানতে চাইবো।

শাইখ সিরাজ : আমাদের এখান থেকে চিনি, রেশমসহ ঐতিহ্যগত বহু কিছু ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে। আমি মনে করি এজন্য আমরা নিজেরাই দায়ী সবচেয়ে বেশি। আন্তর্জাতিক রাজনীতি তো থাকবেই। যে দুর্বল সে মার খাবে, আর সবল হলে তার কাছে সবাই যাবে। আমাদের পাটকলগুলো যখন বন্ধ হয়ে গেল, সারা পৃথিবীতে তখন পাটের চাহিদা বাড়ছে। বাইরে থেকে পাটজাত পণ্য এখন আমাদের দেশে আসছে। আমাদের এখান থেকে রেশম শিল্প চলে গেল ভারতে। আমার তো মনে হয় রেশম বোর্ডটাকে আমাদের দেশে হাতে ধরে অচল করে দেয়া হলো। তৈরি হলো রেশম ফাউন্ডেশন। আসলে এটা ছিল বিশ্বব্যাংকের একটা প্রেসক্রিপশন। ওটাকে শেষ করে দেয়ার জন্যই এটা করা হয়েছে। যা হোক, এখনো এ দেশে যতটুকু অর্জন আছে, কৃষি বিভাগ, কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ চৌদ্দ কোটি মানুষকে খেয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে এটা একটা বড় সাফল্য। ধানের বাইরে, অন্যান্য ফসলের ক্ষেত্রে, কৃষি বিভাগ এবং কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের উল্লেখযোগ্য কোনো সফলতা নেই। বরং কৃষকরা নিজেরাই সাধ্যমতো এগিয়ে নিয়ে গেছে।

কৃষক নিজের চেষ্টায় যে গতিতে এগুচ্ছে, কৃষি বিভাগ সেই গতিতে যেতে পারছে না। এমনকি কৃষককে সহযোগিতাটাও দিতে পারছে না। কৃষি বিভাগের কাছে যে তথ্য নেই, সে তথ্য আমাদের কাছে আছে।

আমি বিশ্বাস করি, কৃষকদের যদি সঠিকভাবে সহযোগিতা করা যেত তাহলে দেশের চেহারাটাই পাল্টে যেত। একটু বাজারজাতকরণের সুবিধা দেয়া, রক্ষণাবেক্ষণ করার সুযোগ করে দেয়া, প্রসেসিং সুবিধা দেয়া, কৃষি শিল্পগুলোকে প্রমোট করা। এখনোও পর্যন্ত একটি শস্যের একক ব্যবহারেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। ধানটাকে চাল করে খেয়ে ফেলা হচ্ছে। এর কোনো দ্বিমুখী রূপ নেই। যেমন গুঁড়ো করে ভাপা পিঠাটাকে একটা আধুনিক রূপ দিয়ে ম্যাগডোনালসের পাশে দাঁড় করানোর পরিকল্পনা নেয়া যেতে পারে। কুড়াটাকে জ্বাল দেয়া হচ্ছে এছাড়া কোনো ব্যবহার নাই। চালের ওপর একটা প্রলেপ থাকে। এটাকে দিয়ে তুষ বানানো হয়। অথচ এই প্রলেপ দিয়ে পৃথিবীর অত্যন্ত মূল্যবান রান্নার তেল হয়। এটা নিয়ে কেউ চিন্তাই করলো না। আশির দশকে রূপণ নামে একটা তেল কোম্পানি ছিল। সহযোগিতা না পাওয়ার তারা পিছিয়ে গেল। নব্বই দশক থেকে মুরগির খামারের ওপর ব্যাপক টেলিভিশন প্রচারণায় ফলে দশ হাজার খামার থেকে এক লাখের বেশি খামার হয়েছে। পঞ্চাশ লাখ মানুষ এই প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত। কিন্তু এখনোও আমরা বাজার থেকে মুরগি এনে কেটে খেয়ে ফেলা ছাড়া আর কোনো ব্যবহার জানলাম না। অথচ অনেক দেশ আছে যারা সারা পৃথিবীতে মুরগি রপ্তানি করে। কোনো দেশ শুধু পা কেন, কোন দেশ পুরো মাংসই কেনে। যখনই একটা পণ্য থেকে কৃষক তিনমুখী-চারমুখী টাকা পায় তখন সামগ্রিক চিত্রটাই বদলে যায়। এই সহযোগিতাটা যদি কৃষকদের দেয়া যেত, তাহলে দেশের ছবিটাই অন্যরকম হতে পারতো।

২০০০ : আপনি যখন মাটি ও মানুষ অনুষ্ঠানটি করেন তখন সেই সময়ের জন্য যেটা প্রাসঙ্গিক ছিল সেটাই দেখিয়েছেন। মানুষ অনুপ্রাণিত হয়ে সেই কাজটি করার চেষ্টা করেছে। পৃথিবীতে বহু দেশ আছে যারা প্রচুর পরিমাণ সবজি আমদানি করে। বলা যায় সবজির যথেষ্ট চাহিদা আছে সারা পৃথিবীতে। এমন অনেক দেশ আছে যারা আমদানি করা সবজির ওপর নির্ভরশীল। আপনি যেহেতু 'হৃদয়ে মাটি ও মানুষ' অনুষ্ঠানে বাজারজাতকরণের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। বাংলাদেশের কৃষক যে সবজিটা উৎপাদন করছে, প্রচারণা আছে সেখানে কীটনাশক বা রাসায়নিক দ্রব্য এতো পরিমাণ ব্যবহার করা হয়, যার কারণে উন্নত

'এ বীজ রাখার ব্যবস্থাটা যদি বেসরকারি পর্যায়ে চলে যায় তাহলে এ দেশের কৃষকের জন্য কঠিন এবং কষ্টকর দিন আসবে। কারণ বেসরকারি বীজ উদ্যোক্তা বা সংরক্ষণকারী প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যবসায়ী। সে তো কৃষককে মায়া করবে না'

দেশগুলোতে এই সবজি যাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। আমি জানতে চাচ্ছি, এই কীটনাশক আমরা ব্যবহার করছি কেন? কীটনাশক ব্যবহার না করে কি উৎপাদন সম্ভব নয়? নাকি পুরো বিষয়টাই কৃষকদের অজানা বা অজ্ঞতা?

শাইখ সিরাজ : কথাটা অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, পৃথিবীর একমাত্র দেশ বাংলাদেশ, যেখানে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় রাসায়নিক সার বা কীটনাশক কম ব্যবহার করে। অথচ আমরা জানি এর উল্টোটা। আমাদের দেশের কৃষকের ঐ পরিমাণ সার কেনার ক্ষমতাই তো নাই। উচ্চফলনশীল আবাদ করতে গেলে, পোকা-মাকড় লাগবেই। এটা পুষ্ট কিন্তু প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল। যে কারণে খুব সহজেই ব্যাকটেরিয়া আক্রমণ করে। তাই কীটনাশক স্প্রে করতে হয়। সারা পৃথিবীতে এই স্প্রেটা যে মাত্রায় করে, আমাদের কৃষকরা তার ধারে-কাছেও যেতে পারে না। বাংলাদেশের অধিকাংশ সবজি যেত মধ্যপ্রাচ্যে। মধ্যপ্রাচ্যে এবং ইউরোপের সবজি বাজারে শুধু তাদের রেজিস্টার্ড ডিপার্টমেন্টাল স্টোরগুলোতে পরিষ্কার বলা থাকে যে এগুলো কেমিক্যাল ব্যবহার ছাড়া। খোলা বাজারে যে কেমিক্যাল সবজি তার চাহিদার শতকরা পনেরো ভাগ আমরা বাংলাদেশ থেকে দিতে পারি। কিন্তু পুরো একশত ভাগ দেয়ার ক্ষমতা আমাদের আছে। দিতে না পারার কারণ হচ্ছে, আমাদের দেশ থেকে শাক-সবজি, ফলমূল যা যায় তা বাংলাদেশ বিমানের যাত্রী ক্যারিয়ারে যায়। যাত্রীদের মালামাল তোলার পর যে জায়গাটুকু থাকে সেখানে এগুলো যায়।

আমরা একাধিকবার সরকারকে বলেছি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, আলাদাভাবেও বলা হয়েছে। অর্কিড চাষের জন্য বিশাল একটা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে ভালুকায়। এদের শতভাগ টার্গেট কিন্তু রপ্তানিমুখী। পারছে না কারণ এই সবজির যে পনেরো ভাগ, বিমান বলছে এখান থেকেই তা দেয়া হবে। কিন্তু সবজিরই তো আরো দরকার। সেখানে অর্কিড ভাগ বসাবে কোত্থেকে? সাইফুর রহমান বলছেন সব দিয়ে দেবেন। তিনি হয়তো জানেনই না যে ভেতরে চিত্রটা এরকম। কার্গো ভাড়া করে তো পোষানো যাবে না। অনেক কিছু বলা যায়। কিন্তু বাস্তব অন্যরকম। আমার কথা হতে কৃষককে সতর্ক থাকতে হবে জৈবিকভাবে সবকিছুর ব্যবহার করায়। কিন্তু তার জন্য যে টেকনোলজি, তা তো কৃষকের হাতে নাই। যে পরিমাণ জৈব সার দরকার তা তো পারিবারিকভাবে তৈরি জৈবসার দিয়ে মেটানো যাবে না। এখন জৈব সারের জাহিদা বাড়ছে। যে কারণে নানান ধরনের সার কেন্দ্র তৈরি হচ্ছে। এই ত্রিশ বছর জমিতে রাসায়নিক সার দিতে দিতে এর উৎপাদন ক্ষমতা শূন্যের কোঠায় নিয়ে আসা হয়েছে। এখন এই জমিগুলোকে আবার উর্বরতা করা না গেলে ঐখানে কিছুই হবে না। কৃষক এইটা বুঝতে পেরেছে বলেই জৈব সারের উপর গুরুত্ব দিচ্ছে।

‘কোটি কোটি মানুষকে খাদ্য দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা হবে, নাকি দেশীয় পদ্ধতিতে চাষ করে কোটি কোটি মানুষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়া হবে? ত্রিশটা ঢেঁকিতে সারা দিনে ত্রিশ কেজি চাল ছাঁটবেন নাকি এর পরিমাণ বাড়ানোর জন্য মেশিনে ভাঙাবেন এটা বিবেচনার বিষয়’

২০০০ : আপনি বলছিলেন, আশির দশকের কৃষক আর ২০০৫ সালের কৃষকের মধ্যে অনেক পার্থক্য। এই পার্থক্যটা একটু নির্দিষ্ট করে বলবেন? আর্থিক জায়গা, সচ্ছলতার জায়গা নাকি উৎপাদন ক্ষেত্রে, না জ্ঞানের জায়গাটা বেড়েছে, নাকি তার ক্রয় ক্ষমতা বেড়েছে। বাড়লে কতটা বেড়েছে?

শাইখ সিরাজ : ক্রয়ক্ষমতা অবশ্যই বেড়েছে। তার অর্থটা আসছে বলেই ক্রয়ক্ষমতা বেড়েছে। তারপর রাস্তাঘাট ভালো হয়েছে। আমি যখন ২০০৪ সালে আবার অনুষ্ঠানটি করতে আসলাম, যদিও গবেষণা শুরু হয়েছে ২০০২ সাল থেকে। আগের যে বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করেছি তার বর্তমান অবস্থা কী? আমার শারীরিক অবস্থা জানার জন্য, কতটা শ্রম দিতে পারবো এই অনুষ্ঠানকে সেটা জানার জন্য পাঁচজন ডাক্তারের সঙ্গে বসেছি। এর কারণ হচ্ছে অনুষ্ঠানটি ধরেই ছেড়ে দেয়ার ইচ্ছে নিয়ে এতো বছর পর আসিনি, আটঘাট বেঁধেই এসেছি। এই রিসার্চগুলো থেকে আমরা যা পেয়েছি সেটা হচ্ছে আশির দশক থেকে নব্বইয়ের মাঝামাঝি এই ষোল বছর আমরা কৃষককে উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছি। ধানের বাইরে অন্যান্য কর্মকান্ডের সঙ্গে জড়িত হওয়ার জন্য। যাতে করে বহুমুখী ক্ষেত্র থেকে সে এই পেতে পারে। নব্বই দশকে আমি যে কৃষককে কয়লা দিয়ে দাঁত মাজতে দেখেছি আজ তাকে দেখবো ব্রাশ দিয়ে মাজতে। একইভাবে আমার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কৃষককে এখন আর চাষ ব্যবস্থায় উদ্বুদ্ধ করবো না। আমি তাকে বাজারজাতকরণে উদ্বুদ্ধ করবো। কৃষিটা আমাদের মূল চালিকাশক্তি এই বিষয়টা যদি শুধু মনে মনে বিশ্বাস না করে প্রতিফলন ঘটানো যেত তাহলে এই যে কয়লার বদলে পেস্ট দিয়ে দাঁত মাজা কৃষকের সংখ্যা শতকরা দশজন না হয়ে পঞ্চাশ জন হতো।

বাংলাদেশের অনেক জেলায় অন্য জেলায় থেকে আমদানি করা সবজি যায়। যেমন সিলেট। প্রচুর অর্থ আছে বলে তারা অলস হয়। একটা শস্য উৎপাদন করে তারা। বাকিটা অন্যান্য জেলা থেকে আনে। সেই সিলেটের মতো জায়গায় মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জের কৃষকরা টমেটোর ফলন করে বিস্ময় সৃষ্টি করেছে। হাজার হাজার মণ টমেটো উৎপাদন হয়। শুধু মাত্র বাজারজাতকরণের অভাবে আড়াই মণের এক গাঠি টমেটো দশ টাকায়ও বিক্রি হয় না। অথচ থাইল্যান্ডের সস আমাদের খেতে হয়। ত্রিশ বছর ধরে সস আমদানি করা হচ্ছে। একটি বিশেষ শ্রেণী ফুলে ফেঁপে মোটা হচ্ছে। এককভাবে কেউ কেউ শক্তিশালী হচ্ছে। যে কারণে দেশে কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়নি। কৃষি প্রধান এই দেশটাতে এই ত্রিশ বছর কৃষিটাকেই অবহেলা করা হয়েছে। এখনো গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে না। তবে অনুধাবন করা হচ্ছে। এই পলিসি তৈরি হয়ে এক্সিকিউট হতে হতে আরো কত বছর লাগবে তা একমাত্র সৃষ্টিকর্তাই জানেন।

২০০০ : কৃষকের ভালো এবং খারাপ দুই অবস্থার কথাই বললেন। কিন্তু সামগ্রিক চিত্রটা আসলে কেমন?

শাইখ সিরাজ : পজেটিভ। তবে এই সামগ্রিক ভালোটা কেউ করে দেয়নি। কৃষক নিজেরটা নিজেই করেছে। একটু যদি শুধু সহযোগিতা করা যেতো তাহলেই চেহারাটা পাল্টে যেত। কৃষক বলছে, আমার দেশের যে ফুলের চাহিদা তা দেশেই উৎপাদন করা সম্ভব। এলসি দিয়ে যে ভারত থেকে ফুল আনা হচ্ছে সেটা বন্ধ করতে হবে।

২০০০ : তার মানে আমদানিটা বন্ধ করলেই কৃষক তার ফুল উৎপাদনের সঠিক মূল্যটা পাচ্ছে?

শাইখ সিরাজ : হ্যাঁ, এই জিনিসটা করতে তো আপত্তি থাকার কোন যুক্তি নেই। এ ব্যাপারটাতে আমলই দেয়া হচ্ছে না। আমি ওখানকার স্থানীয় কৃষি আফিসে গিয়ে জানতে চাইলাম, কত পরিমাণ জমিতে ফুলের আবাদ হয়? তারা বলতে পারলেন না। তার মানে সংশ্লিষ্ট লোকজন জানেই না কতটুকু পরিমাণ জমিতে ফুলের আবাদ হয়।

২০০০ : আমাদের দেশের যে কৃষি অফিসগুলো আছে তারা যদি একটিভ হতো, তাদের যদি একটা পরিসংখ্যান থাকতো যে কত পরিমাণ ফুলের চাহিদা আছে বাংলাদেশে, কতটা উৎপাদন হয় এবং কতটা ঘাটতি বা উদ্বৃত্ত আছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে আমাদের কাছে কোন পরিসংখ্যানই নেই।

শাইখ সিরাজ : চিত্রটা একদম এরকম

যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে প্রয়োজনীয় কোনো তথ্যই নেই।

২০০০ : 'মাটি ও মানুষ' এরপর হৃদয়ে মাটি ও মানুষও বেশ লম্বা একটা সময় পার করলো। যে উদ্দেশ্যে এই অনুষ্ঠানটা শুরু করলেন তো গবেষণা করে যা পেলেন অনুষ্ঠানটা শুরু করার আগে আর অনুষ্ঠান শুরু করার পর এই দুইয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য পেয়েছেন?

শাইখ সিরাজ : পার্থক্য তো কিছু থাকেই। আমার লক্ষ্য ছিল যে এক বছরের মধ্যে যদি সরকারকে একটু বোঝানো যায় বা উৎসাহিত যদি করা যায়। এই 'হৃদয়ে মাটি ও মানুষের' প্রথম অনুষ্ঠানটি ছিল একজন কৃষক একটি বাঁধাকপি উৎপাদন করে, ক্ষেত থেকে এই কপিটি একজন পাইকার কিনে নেয় তিন টাকায়। ঢাকায় কাওরান বাজারে এসে এর দাম হয় বিশ টাকা। আর আমরা স্থানীয় যে বাজার থেকে কিনি সেখানে বিক্রি হয় ত্রিশ টাকায়। কৃষক পেল তিন টাকা। আমি কিনলাম ত্রিশ টাকায়। সাতাশ টাকা নিয়ে গেল কিন্তু মধ্যস্বত্বভোগীরা। যাদের এই উৎপাদনের সঙ্গে কোনো সম্পৃক্ততাই নাই। আমরা এই অনুষ্ঠানটি প্রচার করার দুই/ এক সপ্তাহের মধ্যেই দেখলাম কৃষি মন্ত্রণালয়ে ন্যায্যমূল্য নিয়ে, বাজার নিয়ে মিটিং হল, কথা হল। আমার কাছে মনে হল সরকারি লোকগুলোকে একটু হলেও উদ্বুদ্ধ করা গেছে।

১৯৯২ সালে বরিশালের বানারীপাড়ার বিশালকান্দি ওমরের বাড়ি, সেখানে পানির ওপর চাষ হয়, ভাসমান চাষ দেখিয়েছিলাম। ১৯৯৫ তে আবার তার ফলোআপও দেখিয়েছিলাম। কিন্তু তারপরও আজ পর্যন্ত সেখানে কোনো কৃষি অফিস হল না। এই এক দেড়শ' বছর ধরে নিজেদের মেধা দিয়েই তারা কাজ করে যাচ্ছে। এবার ২০০৪ সালে গিয়ে আমি দেখলাম নব্বইতে যে স্বচ্ছ পানি দেখেছিলাম, এখন আর সেটা নাই। বুঝলাম পরিবেশ বিপর্যয় শুরু হয়েছে। পানি দূষিত হয়ে গেছে। নব্বই পঁচানব্বই সালে একজন মন্ত্রীর কাছে আমার পৌঁছাতে অনেক বেগ পেতে হতো। ২০০৪ এসে সেটা অনেক সহজ হয়ে গেছে। কৃষি গবেষণা কাউন্সিলে একটা সেমিনার করা হল। ওখানে ভিডিও চিত্রটা দেখানো হল। তারপর মন্ত্রী সেখানে গেলেন। তার মানে ১৯৯২ সালে শুরু করে, ২০০৪ সালে একজন মন্ত্রীকে ওখানে নেয়া গেল। একটা বিশাল এলাকার জনগোষ্ঠী ওখানে ঐরকম জীবন ব্যবস্থায় বেঁচে আছে। সব তাদের নিজেদের উদ্ভাবিত ব্যবস্থা। শুধু একটু সহযোগিতা দরকার সেটাও আমরা তাদের দিতে পারছি না।

২০০০ : আরো যদি বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি তাকে দেয়া যেত তাহলে হয়তো আরো ভালো কিছু তাদের কাছ থেকে আমরা পেতে পারতাম।

শাইখ সিরাজ : এই যে জৈবিক ভাবে উৎপাদিত শস্য, সেটা ওখান থেকেই পাওয়া সম্ভব। এটাই একটা মডেল হতে পারে। তারপরও আমি খুব আশাবাদী। এই দেশ উঠবেই। আর সেটা কৃষি থেকেই উঠবে।

২০০০ : টেলিভিশন খুব পাওয়ারফুল মিডিয়া। কিন্তু কৃষককে সচেতন করতে মিডিয়ার ভূমিকা কী? কৃষক কেন্দ্রিক কোন সংবাদ কখনোই ওভাবে গুরুত্ব পায়নি সে ইলেকট্রনিক মিডিয়াই হোক বা প্রিন্ট মিডিয়াই হোক। ইলেকট্রনিক মিডিয়া অবশ্য খুব অল্প দিনের। আপনি বিষয়টি কিভাবে দেখছেন, মিডিয়ার ওই দিকটা নিয়ে...

শাইখ সিরাজ : আমি ২১ ফেব্রুয়ারির যে অনুষ্ঠানটি করছি- 'মূল ধারার অগ্রযাত্রায় গণমাধ্যমের ভূমিকা' এই অনুষ্ঠানে ডকুমেন্টরিতে এই প্রশ্নটাই আমি রেখেছি। সেখানে মাহফুজ আনাম, মতিউর রহমান, এসেছেন। আমি ডকুমেন্টরিতে বোঝাতে চেয়েছি মিডিয়া কৃষিকে কিভাবে সহযোগিতা করেছে গত ত্রিশ বছরে। সেই সহযোগিতার পার্সেন্টেজ কত ছিল। তার কতটুকু এচিভমেন্ট হয়েছে। সেটা কোন মিডিয়া করেছে। ইলেকট্রনিক মিডিয়া নাকি প্রিন্ট মিডিয়া কারা করেছে। না করলে কেন করেনি। ১৯৯৩ সালে বিচিত্রায় প্রচ্ছদ হয়েছিল 'মিডিয়ায় কৃষি কৌশলের বিবর্তন। আজ এই ডুকমেন্টারিটা করার সময় মনে হয়েছে এর নাম এটাই হওয়া উচিত। মিডিয়া আসলেই কৃষি কৌশলের বিবর্তন করেছে। কৌশলটা কৃষক পর্যায় থেকে নয়। শহরেও প্রিন্ট মিডিয়ায় চলে এসেছে। আমি বারবারই চেষ্টা করেছিলাম আধুনিক টেকনোলজির সঙ্গে গ্রামভিত্তিক উৎপাদনের একটা সেতুবন্ধ তৈরি করার। এটা হলেই কিন্তু চেহারাটা একেবারে পাল্টে দেয়া সম্ভব। মিডিয়া এ কাজটি খুব বলিষ্ঠভাবে করতে পারে। একজন ব্যবসায়ী সকালে উঠেই ইন্টারনেট সার্চ করছে। ঐ তথ্যগুলো সে পেয়ে যাচ্ছে।

কিছুদিন আগে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। তিনি ত্রিশ বছর আমেরিকা এবং কানাডাতে ছিলেন। ত্রিশ বছর পর দেশে ফিরে গ্রামের বাড়ি মাগুড়ার শ্রীপুর গেলেন। খেজুরের রস খেতে চাইলেন। কিন্তু কোথাও পেলেন না। কারণ কেউ গাছ কাটে না। ইটের ভাটা খুঁড়ে যাচ্ছে। খুব আহত হলেন ভদ্রলোক। ত্রিশ বছর আগের নস্টালজিয়া কাজ করলো। কানাডার মেপল সিরাপ এসোসিয়েশনের সঙ্গে ঢাকা থেকে তিনি ইন্টারনেটে যোগাযোগ করে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করলেন। তারপর ঐ গ্রামে কিছু যুবককে নিয়ে একটি সংগঠন করলেন। তিনি জেনেছেন যে খেজুরের রসকে এক জ্বালা দিয়ে বোতলজাত করলে কোন রকম প্রিজারভেটিভ ছাড়াই ছয়/সাত মাস সংরক্ষণ করা যায়। যে প্রোডাক্ট এখন আড়ং, নন্দনে পাবেন। আমেরিকাতে যাচ্ছে, আমি যেটা চেয়েছিলাম। একজন শিক্ষিত মানুষের সঙ্গে একজন উৎপাদকের সংযোগ। এই প্রোজেক্ট যদি সাফল্য পায়, তাহলে কিন্তু আমাদের দেশে খেজুরের চাষ শুরু হয়ে যাবে। অথচ খেজুর গাছ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল। আপনার যে প্রশ্ন মিডিয়ার কী ভূমিকা, তার উত্তর বোধ হয় আমার মুখ দিয়ে বলা ঠিক হবে না। ইলেকট্রনিক মিডিয়া কৃষির উন্নয়ন, কৃষি সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে অবিশ্বাস্য ভূমিকা রেখেছে।

'১৯৯২ সালে শুরু করে, ২০০৪ সালে একজন মন্ত্রীকে ওখানে নেয়া গেল। একটা বিশাল এলাকার জনগোষ্ঠী ওখানে ঐরকম জীবন ব্যবস্থায় বেঁচে আছে। সব তাদের নিজেদের উদ্ভাবিত ব্যবস্থা। শুধু একটু সহযোগিতা দরকার সেটাও আমরা তাদের দিতে পারছি না'